শহীদ মতিউর রহমান
- মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মহসিন আলী

বিচ্ছুবাহিনীর আর এক নির্ভিক সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছিল শহীদ মতিউর রহমান। তৎকালীন মহকুমা ও বর্তমান নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানায় প্রতিষ্ঠিত বিলচলন শহীদ ডঃ শামছুজ্জোহা কলেজের ছাত্র ও কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান। মাত্র ১৯ বছর বয়স। এই কলেজে তখন কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যিমিক দ্বিতীয় বর্ষ এবং স্নাতক প্রথম বর্ষ পর্যন্ত পড়ানো হত। ১৯৬৯ সালের দুর্বার ১১ দফার ছাত্রগণ আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ শামছুজ্জোহা শহীদ হন ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারীতে। আর এই মহান শহীদ শিক্ষকের স্মরণেই ১৯৬৯ সালের চলনবিলের প্রাণ কেন্দ্র গুরুদাসপুর থানায় এই বিলচলন শহীদ শামছুজ্জোহা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মতিউর রহমানের গ্রামের বাড়ি তৎকালীন পাবনা ও বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার দীঘি শগুনা গ্রামে। এই গ্রামটি গভীর চলনবিলের মাঝে অবস্থিত। বর্ষাকালে নৌকা ও শুকনো সময়ে পায়ে হাঁটা ছাড়া এ এলাকায় চলাচলের আর কোন বিকল্প ছিল না। তখনও তাড়াশ থানায় কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশাল চলনবিলের কয়েকটা থানার মাঝে গুরুদাসপুর থানাতেই প্রথম শহীদ শামছুজ্জোহা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি তখন সিরাজগঞ্জ, নাটোর ও পাবনা ছাড়া আর কোন কলেজ ছিল না এই গুরুদাসপুর বিলচলন শহীদ শামছুজ্জোহা কলেজ ছাড়া। মতিউর রহমান তাই তাড়াশ থানা থেকে গুরুদাসপুরে পড়তে আসে।

শহীদ শামছুজ্জোহা কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রথমেই যারা উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে শহীদ মতিউর রহমান, শহীদ মোবারক হোসেন ও শহীদ আবদুল খালেক অন্যতম। কলেজ প্রাঙ্গণে টিনের চালায় একটি ছাত্র নিবাস তৈরী করা হয়েছিল। এই ছাত্র নিবাইে থাকত মতিউর রহমান। ১৯৭১ সালে ১ম বর্ষ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিল মতিউর। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলেজ বর্জন করে দেশ মাতৃকার মুক্তির টানে সে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। গুরুদাসপুর বিলচলন শহীদ শামছুজ্জোহা কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি মতিউর এই কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতিও নির্বাচিত হয় ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে। ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় এই ছাত্র নেতা মতিউর ১৯৬৯ সালের দুর্বার ১১ দফার ছাত্রগণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সার্বক্ষণিকভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের প্রথম থেকেই সে গুরুদাসপুর ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রতিটিদিনই সে ছাত্র ছাত্রীদের মিছিল ও ছাত্র গণবিক্ষোভে অংশ নেয়। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর মতিউর তার সহযোগী ছাত্রনেতা মোবারক ও খালেকসহ গুরুদাসপুর ছাত্র জনতার আন্দোলনকে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্বার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ছাত্র জনতার মহা গণআন্দোলনের মাঝে সে স্বাধীন বাংলার নতুন সূর্য দেখতে পায়। আর সেই

প্রত্যাশায় সবার সাথে রাতদিন মুক্তিযুদ্ধের লক্ষে সে কাজ করতে যায় নিবেদিত প্রাণে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সেই গণহত্যার ভয়াল কালো রাত্রির পর ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা মতিউরকে যেন মুক্তিযুদ্ধের নেশায় আবেগ আপ্লুত করে তুলে। ছাত্র জনতাকে নিয়ে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার কাজে সে নিয়োজিত করে তার সকল শক্তি সামর্থ। এদিকে ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিলের পরে রাজশাহী শহর থেকে মহসিন আলী গুরুদাসপুরে ফিরে এসে বিচ্ছুবাহিনী গঠনে প্রত্যয়ে কাজ শুরু করলে মতিউর ও মহসিন আলীর সাথে যোগাযোগ শুরু করে ও বিচ্ছুবাহিনীর সদস্য হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। রাজশাহী জেলার গুরুদাসপুর থানা ও পাবনা জেলার তাড়াশ থানার মাঝে শিকারপুর গ্রামে বিচ্ছুবাহিনীর প্রথম আত্মপ্রকাশ করলে মতিউর তার অগ্রভাবে থেকে চালিয়ে যেতে থাকে তার কার্যক্রম। নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা সদর মহকুমায় প্রাণকেন্দ্র গুরুদাসপুর, তাড়াশ ও চাটমহর থানার তরুণ যুবক ও ছাত্রদেরকে বিচ্ছুবাহিনীতে যোগদান করানো ও তাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে মহা উৎসাহ উদ্দীপনায়।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নাটোর থেকে কয়েক ট্র্যাক পাক হানাদার বাহিনী স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীদের সহযোগিতায় গুরুদাসপুর থানা সদরে হামলা করে এবং গুরুদাসপুরে হিন্দুদের বাড়ি ঘর ও দোকানপাট ভাঙচুড় ও লুটপাট করার পরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ সমর্থক অনেক মুসলমানদের বাড়িঘর দোকান পাটেও তারা হামলা চালায়। চারিদিকে ট্র্যাক থেকে এলো পাথারিভাবে মেশিন গানের গুলি চালাতে থাকে। প্রচুর লোক আহত ও কিছু লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পাক সেনাদের গুলিতে। চারিদিকে শুরু হয় চিৎকার আর কান্নার রোল। সবাই বাড়ি ঘর ব্যবসা ছেড়ে শুধু জীবন নিয়ে পালাচ্ছে। এমনি সময় ছাত্র নেতা মতিউর রহমান ও মোবারক হোসেন অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে গুরুদাসপুরে নদীর ঘাটে আসে ও নৌকায় করে লোকজনদেরকে নদীর ওপারে পার করতে থাকে। বেশ কয়েকটা নৌকা নিয়ে ছাত্ররা মতিউরের নেতৃত্বে শত শত লোকজনকে পার করে চলছে নদীর ওপারে। এমনি এক সময়ে পাকসেনারা তাদের বাঙালি মুসলমান দোসরদের সহযোগিতায় নদীর ধারে চলে আসে ও নৌকাগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। এই সময় ছাত্র নেতা মোবারক হোসেন নৌকা চালানো অবস্থায় পাক হানাদারদের গুলিতে শহীদ হয় এবং অনেক ছাত্র ও জনগণ আহত হয়।

এই বিভিষিকাময় দিন থেকে ছাত্র নেতা মতিউর রহমান ব্যক্তিগত ভাবে বেঁচে গেলেও মানসিকভাবে সে বিপর্যস্ত হয়ে পরে তার অতীব ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা গুরুদাসপুর বিলচলন শহীদ শামছুজ্জোহা মহবিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেনকে হারিয়ে। দিনের শেষে বিধ্বস্ত গুরুদাসপুরের বাড়ি ঘর ব্যবসা বাণিজ্যসমূহ ও সর্বোপরি নারী পুরুষ শিশুদের পূনর্বাসন নিয়ে মতিউর মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য। কয়েকদিন পর বিচ্ছু বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে ফিরে আসে সে। বিচ্ছু বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতে যেয়ে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় মতিউরকে। তবে এই মুহুর্তে ভারতে যেতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় বলে সে জানায়। তখন তাকে তার ইচ্ছানুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

এদিকে সিরাজগঞ্জ মহকুমার উল-াপাড়া থানার আবদুল লতিফ মীর্জা তার নামে মীর্জা বাহিনী গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের কাজ শুরু করে দিয়েছে। উল-াপাড়া ছাড়াও মীর্জা বাহিনী রায়গঞ্জ থানার নওগাঁর কাছে ও চাটমহর থানার হান্ডিয়াল হাটের পাশে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। মতিউরের বাড়ি তাড়াশ থানায় হলেও তার গ্রাম নওগাঁ হাট ও হান্ডিয়াল হাটের কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। বেশ কয়েক মাইলের ব্যবধান হলেও চলনবিলের ভরা পানিতে নৌকায় যেন তা সারা দিনের পথ। মতিউরের গ্রামের অনেক যুবকই নওগাঁ ও হান্ডিয়াল ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে। বিশেষ করে কমান্ডার আবদুর রহমান, আমজাদ হোসেন ও আফজালদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য মতিউর ব্যস্ত হয়ে উঠে। বিচ্ছুবাহিনী থেকে তখন তাকে মীর্জা বাহিনীর ক্যাম্পে দুটোতে নওগা ও হান্ডিয়ালে যেয়ে তার পরিচিত বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পরামর্শ দেয়া হয়। মীর্জা বাহিনী ও বিচ্ছুবাহিনীর সাথে এক বিশেষ সামরিক ও কৌশলগত যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব দেয়া হয় মতিউরকে। বিশেষ করে একজন আক্রান্ত হলে অপরজন সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং প্রয়োজনে যৌথভাবে পাক বাহিনী ও তাদের রাজাকার দোসরদের বিরুদ্ধে হামলা করার জন্য এই সহযোগিতার ভীষণ প্রয়োজন। মতিউর সেই দায়িত্ব নিয়ে মীর্জা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার লক্ষে হান্ডিয়াল ও নওগা ট্রেনিং ক্যাম্প চলে যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য।

চাটমহর থানার হান্ডিয়াল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মতিউর প্রথমে ভর্তি হয় সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য। সেখানে সে খুজে পায় তার পূর্ব পরিচিত কমান্ডার আবদুর রহমান, আমজাদ হোসেন ও আফজাল হোসেনসহ তাড়াশ থানার অনেক যুবক বন্ধুদেরকে। প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে মতিউর মীর্জা বাহিনীর প্রধান আবদুল লতিফ মীর্জার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে ও বিচ্ছু বাহিনীল সাথে মীর্জা বাহিনীর যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবহিত করে। আবদুল লতিফ মীর্জা অতি আগ্রহের সাথে বিচ্ছু বাহিনীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আর তখন থেকেই শুরু হলো মীর্জা বাহিনীর সাথে বিচ্ছুবাহিনীর সকল ধরনের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সকল প্রকার সহযোগিতার কার্যক্রম। মতিউর প্রশিক্ষণের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন গ্রামে আসত। যুদ্ধাপযোগী উৎসাহী যুবকদেরকে কখনো বিচ্ছুবাহিনীতে কখনো মীর্জা বাহিনীতে নিয়ে আসত। বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকার জন্য গোপন আশ্রয়স্থলও নিয়মিতভাবে ঠিক করে যাচ্ছে সে।

মীর্জা বাহিনীর মূলত ক্যাম্প করে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি বেশী ছিল আর বিচ্ছুবাহিনীর ছিল গোপন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি। তাই বিচ্ছু ও মীর্জা বাহিনীর পারস্পরিক প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী।

এইভাবে গড়ে তুলে মতিউর রহমান তার মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গণ। বিচ্ছু বাহিনী ও মীর্জা বাহিনীর মাঝে বিশাল চলনবিল এলাকার গ্রামে গ্রামে সে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ, গোপন আশ্রয়স্থল ঠিক করা ও প্রয়োজনে সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে যোগদান করা সব কিছুতেই মতিউর নির্ভিক চিত্তে অংশগ্রহণ করে সক্রিয়ভাবে। মীর্জা বাহিনীর সাথে পাকসেনাদের এক তুমুল যুদ্ধ হয় আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে। প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী এই সম্মুখ যুদ্ধে পাকবাহিনী অবশেষে বিমানবাহিনী যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। রায়গঞ্জ থানার নওগাঁ হাটের ওপর এই সম্মুখ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। মতিউর এই যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। চলনবিলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজনকে সংঘটিত করে ও

বিচ্ছুবাহিনী অনেক সদস্যদের নিয়ে মীর্জা বাহিনীর সাথে যোগ দেয় ও পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সম্মুখ যুদ্ধে ও গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ চলার পর অবশেষে পাকসেনারা পিছু হটে সিরাজগঞ্জ শহরের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মীর্জা বাহিনীর প্রধান আবদুল লতিফ মীর্জার নাম চলনবিল এলাকায় বীর-মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ছড়িয়ে পরে তখন। সাথে সাথে কমান্ডার আবদুর রহমান, কমান্ডার আমজাদ হোসেন, আফজল হোসেন ও মতিউর রহমানের নামও এলাকায় ছড়িয়ে পরে ব্যাপকভাবে যা পাকবাহিনীসহ তাদের দোসর স্থানীয় রাজাকার, শান্তি কমিটি, জামায়াত ইসলামী ও মুসলিম লীগদের জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর পরই আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হয় চাটমহর থানার বিখ্যাত হান্ডিয়াল হাটের যুদ্ধ। পাকসেনারা হঠাৎ একদিন হান্ডিয়াল বাজারে এসে স্থানীয় লোকজনের বাড়ি ঘর ও দোকানপাট লুটপাট ও পুড়িয়ে দিতে শুরু করে। নির্বিচারে লোকজনকে হত্যা করতে থাকে ও মেয়েদেরকে উঠিয়ে নিয়ে নেয় পাকসেনাদের ট্র্যাকে। স্থানীয় রাজাকার, শান্তিকমিটি জামায়াত ও মুসলিম লীগের ঘাতকরা তাদের পাক প্রভুদের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে এই ধ্বংস লীলায়। এদিকে মীর্জা বাহিনী হান্ডিয়াল হাট প্রায় দুই মাইল দূরত্বের মাঝে ঘিরে ফেলে। সিরাজগঞ্জ ফিরে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা ব্রিজ নিজেদের দখলে নিয়ে পাকসেনাদের অবরোধ করে ও তাদের পালানোর সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পাকসেনারা তখণ হান্ডিয়াল বাজারেই ক্যাম্প করে বসে এবং হত্যা, নারী ধর্ষণসহ সকল প্রকার নির্যাতন ও অত্যাচার চালাতে থাকে স্থানীয় নিরীহ মানুষের ওপর। প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের শেষে বিমানবাহিনীর বোম্বিং এর সহযোগিতায় পাক সেনারা অবশেষে সিরাজগঞ্জ যাওয়ার রাস্তা পরিস্কার করে পিছু হটে সিরাজগঞ্জ চলে যেতে বাধ্য হয়। হান্ডিয়াল হাট গুরুদাসপুর থানা বিশেষ করে বিচ্ছুবাহিনীর অবস্থানের অনেক নিকটে হওয়ায় বিচ্ছুবাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ এই হান্ডিয়াল হাটের যুদ্ধে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। মতিউর এই যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করলে গুরুদাসপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তার যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে মতিউর রহমান গুরুদাসপুর থানার মধ্যে চলে আসে তার মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনকি কাজের জন্য। তখন তাকে ভারতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। বিচ্ছু বাহিনীর প্রধান মহসিন আলী (লেখক) ভারতে যাওয়ার সময় মতিউরকে তার সাথে যাওয়ার জন্য আহবান জানালে সে পরের বারে যাবে বলে জানায়। এখন সে স্থানীয়ভাবেই তার কাজ করতে চায়। শিকারপুর গ্রামে অবস্থানের পর সে গুরুদাসপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম নারায়নপুরে চলে আসে। অতীব সংগোপনে সে তার ছাত্র লীগের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। সহসা ১৯৭১ সালের ২১ আগস্ট রাত্রে রাজাকারেরা ঘিরে ধরে তার আশ্রয় স্থল এবং তাকে জীবন্ত অবস্থা বন্দি করে নিয়ে আসে চাচকৈড় বাজারের গুরুদাসপুর থানার রাজাকার বাহিনীর হেড কোয়াটারে।

বন্দি করার পর থেকেই তার উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করে রাজাকারেরা। রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে এসে তাকে সিলিং এর সাথে ঝুলিয়ে প্রতিনদিনরাতই বেধম প্রহার করত বিচ্ছুবাহিনী ও মীর্জা বাহিনীর অস্ত্রসস্ত্র ও যোদ্ধাদের খোজ খবর নেয়ার জন্য বিশেষ করে কারা তাদের সহযোগিতা করছে তা বিশেষভাবে জানার জন্য। প্রতিদিনই মতিউরকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলত। খাওয়ার পানি চাইলে গরম পানি বা প্রশ্রাব করে দিত তার মুখে।

তার মাথা মুখমন্ডল ও সারা দেহ রক্তে জর্জড়িত হয়ে যেত প্রতিদিনই। এক পর্যায়ে নিষ্ঠুর ঘাতক রাজাকারের একে একে মতিউরের হাত ও পায়ের রগগুলো কেটে ফেলে দেয়। এরপর মতিউরের দুটো চোখই তারা খুচিয়ে খুচিয়ে উঠিয়ে ফেলে। অন্ধ মতিউরকে তবুও দয়া করেনি এই নৃশংস ঘাতক রাজাকারেরা। হাঁটুর উপর পানির মধ্যে একটা খুটির সাথে দড়ি দিয়ে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখত যেন পরে না যায়। খাবার ও পানি কিছুই দেয়া হত না। কখনো মেঝেতে শুতে বা বসার সুযোগও দিত না। হয় তাকে ঝুঁলিয়ে পিটাতো আবার অন্য সময় পানির মধ্যে দাঁড় করিয়ে খুটির সাথে সারা দেহ বেধে রাখত। দুইদিন ধরে এমনি অমানুসিক নির্যাতন করে তৃতীয় দিনে তার হাত পায়ের রগ কেটে ফেলে দেয় ও তার দুটো চোখই চাকু দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে উঠিয়ে নেয়। তেইশে আগস্টের গভীর রাতে চাঁচকৈড়ের নন্দকুজা নদীর মাঝে নৌকায় করে নিয়ে যায় এবং তার বুকে ও মাথায় রাইফেল ধরে গুলি করে নদীতে ফেলে দেয়। হায়রে বাঙালি মুসলমান রাজাকারদের নৃশংসতা, যা পৃথিবীর সর্বযুগের সব ধরনের নৃশংসতাকে হার মানিয়ে দেয়।

আমরা ১৯৭১ সালের ২১ আগস্ট ভারত থেকে নৌকায় পদ্মা নদী পাড় হয়ে লালপুর থানা হয়ে নাটোর মহকুমার মধ্যে ঢুকে পরি এবং বিভিন্ন আশ্রয়ে অবস্থান করে ২৪ আগস্ট রাতে বড়াইগ্রাম থানার ধনী সরকারের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। এখানে এসেই জানতে পেলাম যে মতিউর রহমানকে গুরুদাসপুরের রাজাকারেরা চাঁচকৈড় হাটের রাজাকার ক্যাম্পে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এ খবরে আমরা কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমার সঙ্গে ভারতের দেরাদুন থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৮ জন সৈনিক আছে যাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপরেই। আমি তখন আমাদের লোকদের মাধ্যমে খোজ নিতে লাগলাম যে বিচ্ছুবাহিবনী ও মীর্জাবাহিনী মতিউরকে উদ্ধারের জন্য কতটুকু কাজ করতে পেরেছিল। পরে জানতে পারলাম যে গুরুদাসপুর থানা হেড কোয়ার্টারে পাকিস্তানী মিলিশিয়াদের (প্যারামিলিটারী) ক্যাম্প করেছে এবং প্রতিদিনই কয়েকবার করে নাটোরের ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে অবস্থিত ব্রিগেডিয়ার শেরওয়ানীর নেতৃত্বাধীন পাকসেনা গুরুদাসপুর ও চাচকৈড় পাহাড়া দিতে আসত। রায়গঞ্জ থানার নওগাঁ ও চাটমহর থানার হান্ডিয়ালের ব্যাপক সম্মুখ যুদ্ধে পিছু হটার পর নাটোরের পাকসেনা চলনবিল এলাকায় বিচ্ছুবাহিনী ও মীর্জা বাহিনীর জন্য সদা সন্ত্রস্থ হয়ে পরে। তাই তাদের শক্তি অধিকতর করে তারা চলনবিলের কিনারায় অবস্থিত গুরুদাসপুর থানা এলাকায় ভারি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিয়মিত পাহাড়া দিতে থাকে। আর সে কারণেই পাকসেনা, মিলিশিয়া ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মতিউরকে রাজাকার ক্যাম্প থেকে মুক্তি করে আনা বড়ই কঠিন কাজ মনে করে তারা সময় নিয়ে মীর্জা বাহিনী ও বিচ্ছুবাহিনীকে একত্রে সংগঠিত করতে থাকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মাত্র তিনদিনের মাথা রাজাকারেরা এত নৃশংসভাবে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে অবশেষে মতিউরকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিবে তা বিচ্ছুবাহিনী ও মীর্জা বাহিনীর সদস্যরা ভাবতে পারেনি। তাদের যৌথ প্রস্তুতির মাঝেই খবর এলো যে মতিউরকে রাজাকারেরা হত্যা করেছে।

মতিউরের হত্যা হওয়ার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে সারা চলনবিল এলাকায় এক থমথমে ভাবের সৃষ্টি হয়। মুক্তিযোদ্ধারা মতিউর হত্যার প্রতিশোধ নিবে এই আশঙ্কায় স্বাধীনতা বিরোধীরাও ভীতির মধ্যে থাকে। এদিকে

মতিউরের লাশ পাওয়ার জন্য তার পরিবারের সদস্যরা এবং বিচ্ছু ও মীর্জা বাহিনীর সদস্যরা নন্দকুজা ও আত্রাই নদীর ধার দিয়ে নিরীক্ষা করতে থাকে। অবশেষে সাতদিন পর চাচকৈড় থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে বড়াল ব্রীজ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে মতিউরের ক্ষতবিক্ষত লাশ ফুলে ফেঁপে ভেসে উঠে। শহীদ মতিউরের লাশ নদী থেকে উঠিয়ে তার গ্রামে বাড়ি তাড়াশ থানার দীঘি শগুনা গ্রামে পৈত্রিক ভিটায় দাফন করা হয়।

অকুতভয়ী এই নির্ভিক মুক্তিযোদ্ধা মতিউরের অকাল মৃত্যু অত্র এলাকার সবাইকেই যেমন দুঃখে শোকে মর্মাহত করে তেমনি তার সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ আমাদের সবার জন্য নতুন করে মুক্তিযুদ্ধে শপথ নিতে উৎসাহিত করে। জীবন বাজী রেখে দেশকে স্বাধীন করে মতিউর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার চরম প্রতিজ্ঞায় সবাই আমরা পুনরায় নতুন প্রেরণা ও প্রাণ চাঞ্চল্যে সংগঠিত হই।

শহীদ মতিউর রহমানের করুণ মৃত্যু অত্র এলাকার সবাইকে যেমন নাড়া দিয়েছিল তার প্রিয় বিলচলন শহীদ শামছুজ্জোহা কলেজের ছাত্র শিক্ষক কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদেরকেও চরমভাবে শোকে মূয়মান করে। এই কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহ-সভাপতি ও সবার প্রিয় ছাত্র নেতা শহীদ মতিউর রহমান। তাই সবার কাছে সে হয়ে উঠে এক সম্মানীত অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার চরম ও পরম ত্যাগ কেউ কোন দিন ভুলবে না। স্বাধীন বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাসে শহীদ মতিউরের নাম সদা সর্বদাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাই বিলচলন শহীদ শামছুজ্জোহা ছাত্র সংসদের দাবীতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই কলেজের ছাত্র নিবাসকে শহীদ মতিউরের নামে নামকরণ করে শহীদ মতিউরকে তার প্রিয় কলেজ প্রাঙ্গণে আরো চিরস্থায়ীভাবে স্মরণীয় করে রাখে। যে ছাত্র নিবাসে মতিউর দুইটি বছর কাটিয়েছে আবাসিক ছাত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে তার চরম ও পরম ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ আজ তার ঋণের কিছুটা হলেও পরিশোধ করা ও তার ঝড়ানো রক্তের কিছুটা মূল্য দেয়া চেষ্টা করেছে স্থানীয় ছাত্র জনগণ ও তার প্রিয় কলেজ কর্তৃপক্ষ।

চলনবিলের প্রাণ কেন্দ্র গুরুদাসপুরের এই বিলচলন শহীদ শামছুজ্জোহা মহাবিদ্যালয় দুই দুইজন বীর স্বাধীনতা যোদ্ধা শহীদের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে। ১৯৬৯ সালের মহান ছাত্রজনতার ১১ দফা আন্দোলনের শহীদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শামছুজ্জোহা ও ১৯৭১ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ মতিউর রহমান। তোমাদেরকে লাল সালাম, শহীদ ডঃ শামছুজ্জোহা ও শহীদ মতিউর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশ ধণ্য আজ তোমাদের মত মহাত্যাগী শহীদ সন্তান পেয়ে। ধন্য গুরুদাসপুর ও চলবিল এলাকা এমনই দুইজন মহান শহীদদের সম্মান দিতে পেরে। ধন্য আমরা সবাই ও ভবিষ্যতের সকল প্রজন্ম যারা এই স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতা ভোগ করছি মহান অমর শহীদ ডঃ শামছুজ্জোহা ও শহীদ মতিউর রহমানের ত্যাগের বিনিময়ে। আমরা তোমাদের ঝরা রক্তের কাছে চির ঋনী। শহীদ মতিউর রহমান, তোমার হাস্যজ্জ্বোল সেই চেহারা আজো অম্-ান হয়ে ভাসছে আমার সামনে। তোমাকে আমরা কাখনো ভুলব না।